আয়বৈষম্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

Policy Research Institute, Bangladesh. | 1

আয়বৈষম্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

Thursday, May 10, 2012

By Dr. Sadiq Ahmed

স্বাধীনতালাভের পর সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দারিদ্র্য বিমোচনে জোরালো অগ্রগতি বাংলাদেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন।

মাথাপিছু আয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি উন্নয়নে বড় ভূমিকা রেখেছে। কী হারে আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়েছে, তার একটি ছোট্ট পরিসংখ্যান এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। সত্তরের দশকে বাংলাদেশের বার্ষিক মাথাপিছু আয় প্রবৃদ্ধি ছিল ২ শতাংশেরও কম, যা গত দশকে প্রায় ৫ শতাংশের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। মাথাপিছু আয়ের এমন বৃদ্ধি সত্ত্বেও কয়েকটি বিষয়ে শঙ্কা রয়েই গেছে। যেমন এ দেশের আনুমানিক ৪৭ মিলিয়ন মানুষ এখনো জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। আশার কথা হলো, আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটছে দ্রুততার সঙ্গে। এ গতি অব্যাহত থাকলে আগামী কয়েক বছরে দরিদ্রের সংখ্যা আরও কমিয়ে আনা কঠিন হবে না। তবে জটিলতা অন্য খানে। বাংলাদেশে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি আয়বৈষম্যও বাড়ছে এবং এ কারণে বিমোচনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রত্যাশিত সুফল পরিলক্ষিত হচ্ছে না। খানা আয়-ব্যয় জরিপ (হাউসহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে বা এইচআইইএস) থেকে পাওয়া উপাত্তের ভিত্তিতে তৈরি গিনি সহগে (গিনি কো-এফিসিয়েন্ট) দেখা যায়, আমাদের আয়বৈষম্য বাড়ছেই। ১৯৮৩-৮৪ সালে গিনি সহগ ছিল দশমিক ৩৯ শতাংশ, যা ২০০৫-০৬ সালে দশমিক ৪৭ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। অবশ্য ২০১০ সালে তা কিছুটা কমে দশমিক ৪৬ শতাংশে নেমে আসে। ২০১০ সালে সামান্য কমে এলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশে গিনি সহগের পরিবর্তনের প্রবণতা মূলত ঊর্ধ্বমুখী।

গিনি সহগের বাইরে আয়বৈষম্যের আরেকটি বড় মাত্রা হলো খানার আয়ের হিস্যা বা ইনকাম শেয়ার। জনসংখ্যা স্তরের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ উপার্জনকারীর আয়-ব্যবধান সাম্প্রতিক সময়গুলোয় বেড়েই চলেছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ উপার্জনকারীর ইনকাম শেয়ার ছিল ১ দশমিক ২ শতাংশ, যা ২০১০ সালে কমে দাঁড়ায় দশমিক ৮ শতাংশ। এর সঙ্গে সর্বোচ্চ উপার্জনকারী ৫ শতাংশ জনসংখ্যার ইনকাম শেয়ার তুলনা করলে দেখা যায়, একই সময়ে তা ১৮ দশমিক ৩ থেকে বেড়ে ২৪ দশমিক ৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিজনিত

আয়বৈষম্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

Policy Research Institute, Bangladesh. | 2

আয়ের বৃদ্ধি আয়-স্তরের সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ মানুষের মধ্যেই ঘনীভূত হচ্ছে। এর নেতিবাচক প্রভাব গিয়ে পড়ছে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে; পাশাপাশি সৃষ্টি হচ্ছে আপেক্ষিক বঞ্চনার সামাজিক চ্যালেঞ্জ। এটি দ্রুত মোকাবেলা করা জরুরি। কারণ ইতিহাস ঘাঁটলে এমন অনেক উদাহরণ মেলে যে, নাগরিকদের জীবনমানে দীর্ঘস্থায়ী ব্যবধান সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

দেশে ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য নিয়ে সরকার, বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজ মাঝে মধ্যেই তাদের উদ্বেগ জানায়। তবে এটি মোকাবেলার জন্য যে সামঞ্জস্যপূর্ণ কৌশল প্রণয়ন এবং নীতির বাস্তবায়ন দরকার, তা আলোর মুখ দেখেনি। এ কথা বললে আবার অনেকে প্রতিবাদ করেন— আমরা সরকারে থাকাকালে আয়বৈষম্য দূরীকরণে কি অমুক কর্মসূচি নেয়নি? সত্য যে, (প্রধানত জনপ্রিয়তা বাড়াতেই) বাংলাদেশের অনেক সরকারই সীমিত পরিসরে বিভিন্ন সময় চ্যালেঞ্জটি মোকাবেলায় নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। যে কারণেই হোক, সেসবের ফল পাওয়া গেছে সামান্যই।

ভাবলে ভুল হবে যে, বাংলাদেশই বুঝি একমাত্র দেশ— যেখানে আয়বৈষম্য বাড়ছে। আমাদের সামনে চীন ও ভারতের দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়বৈষম্য বেড়েছে। এ বিষয়ে তাত্ত্বিক অর্থনীতিশাস্ত্রে একটি জনপ্রিয় বিতর্ক আছে, যার প্রবক্তা নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ সিমোন কুজনেটস। তিনি বলেছিলেন, স্বল্প আয়ের দেশে দ্রুত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ঘটলে তাদের আয়বৈষম্য বাড়ে। নির্দিষ্ট আয়-স্তরে পৌঁছার পর আবার সেটি কমতে থাকে। উল্টা ‘ইউ’-এর আকৃতির বক্ররেখা, যা কুজনেটস হাইপোথিসি নামে অধিক পরিচিত। তত্ত্বটির সঠিকতা নিয়ে গবেষণা হয়েছে বিস্তর। তবে উপসংহারে আসা গেছে কম ক্ষেত্রেই। আগে থেকে ধারণা করা ঠিক হবে না যে, উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আয়বৈষম্য বাড়াবেই। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সম্পদ-সম্পত্তি বণ্টনে প্রাথমিক অসমতাই আয়বৈষম্যে প্রতিফলিত হয়। সমস্যা হলো, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর নীতি ও কৌশল প্রণয়নের সময় কার্যত আয়বৈষম্য নামের চ্যালেঞ্জটির প্রতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খেয়াল রাখা হয় না। কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ হতাশ হয়ে মন্তব্য করেন, সম্পদের প্রাথমিক বণ্টনের অসমতা-সম্পর্কিত নীতিগুলোয় পরিবর্তন আনতে পারলেই সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাবে। এ ধারণার এক চরম সীমায় সমাজবাদী ও সাম্যবাদী দর্শন এমন কিছু প্রতিজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানায় সম্পদ-সম্পত্তি থাকতে পারবে না এবং আয়ের পুনর্বণ্টন হতে হবে সরাসরি রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে। বাংলাদেশ এখন বাজার-অর্থনীতির দেশ। আয়বৈষম্য দূরীকরণে এখানে সম্পদ-সম্পত্তির বৈপ্লবিক পুনর্বণ্টনমূলক কর্মসূচি নেয়া বাস্তবসম্মত নয়।

সীমিত আকারে জমি পুনর্বণ্টনের যে প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল, তা-ও বাস্তবসম্মত বিকল্প ছিল না। অন্যান্য দেশের ভূমি পুনর্বণ্টনসংক্রান্ত কিছু হতাশাজনক অভিজ্ঞতা আমাদের অজানা নয়।

আয়বৈষম্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

Policy Research Institute, Bangladesh. | 3

এ ধরনের নীতি অধিকাংশ দেশে সফল হয়নি। অনেকে অবশ্য বলতে চান জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার কথা, যে দেশগুলো জমি পুনর্বণ্টনমূলক নীতির সহায়তায় আয়বৈষম্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সফলতা দেখিয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে— কোরিয়া-জাপানের ভূমি সংস্কার একটি বিশেষ নজির, যা অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনীয় নয়। তার চেয়ে বড় কথা হলো, বাংলাদেশে জমিমালিকানার গড় আকার খুবই ছোট। আবার ব্যক্তিমালিকানায় বড় আকারের জমিজমা রয়েছে, এমন লোকের সংখ্যাও কম। দেশে বিদ্যমান জমির বড় অংশের মালিক সরকার। ব্যবস্থাপনাজনিত গুরুতর কিছু সমস্যা যেমন পেশাদার ভূমিদস্যুর সঙ্গে রাজনৈতিক যোগসাজশ প্রভৃতির কারণে জমি পুনর্বণ্টনে সরকারের নেয়া বিভিন্ন উদ্যোগ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সফলতার মুখ দেখছে না।কথা হলো, দেশে আয়বৈষম্য বেড়ে চলছে। সরকার এখনই সর্বোচ্চ মনোযোগ না দিলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটতে পারে। মানবসম্পদ ও উপার্জনসক্ষমতা বাড়াতে সক্ষম এমন নীতি, বিধিমালা এবং প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে সম্পদেও গতিশীল পুনর্বণ্টন এ ক্ষেত্রে একটি প্রতিশ্রুতিশীল ও সম্ভাবনাময় সমাধান হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমাদের দুটি মৌলিক অধিকার— উন্নততর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। গত কয়েক বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছে, সাফল্য এসেছে লিঙ্গভিত্তিক সমতায়ও। তা সত্ত্বেও ২০১০ সালের শ্রমশক্তি জরিপ দেখাচ্ছে, এ দেশের ৪০ শতাংশ শ্রমশক্তি কোনো ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয় এবং মাত্র ২৩ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডি পার করেছে। উচ্চতর শিক্ষা রয়েছে মাত্র ৪ শতাংশ শ্রমশক্তির। শিক্ষার মতো স্বাস্থ্যসেবার কিছু সূচকে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশ লক্ষণীয় উন্নতি করলেও এ ক্ষেত্রে আরও উন্নয়ন প্রয়োজন। সমস্যা হলো, এ দুটি খাতের বাজেট বরাদ্দ অপর্যাপ্ত। বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমবেশি জিডিপির ২ দশমিক ৪ শতাংশ এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে মাত্র ১ শতাংশ। এর সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার বাজেট তুলনা করলে দেখা যায়, দেশটি জিডিপির ৪ দশমিক ৮ শতাংশ শিক্ষা এবং ৩ দশমিক ৫ শতাংশ বরাদ্দ ব্যয় করে স্বাস্থ্যসেবায়।

স্পষ্টত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানবসম্পদ গঠনে দ্রুত উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে সরকার আয় বণ্টনব্যবস্থার উন্নতি করতে পারে। এতে দরিদ্র জনগোষ্ঠি পাবে উন্নততর ও অধিক বেতনে চাকরির সুযোগ। এর দুটি ইতিবাচক দিক রয়েছে। প্রথমত. দরিদ্র জনগোষ্ঠীতে শিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান শ্রমশক্তি তৈরি হলে তা অবদান রাখে আয়বণ্টনে। দ্বিতীয়ত. একই সঙ্গে এর ভূমিকা রয়েছে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতেও। এ মানবসম্পদ তৈরি করতে চাইলে অবশ্যই শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। আমার মতে, শিক্ষাক্ষেত্রে ৪ ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ কমপক্ষে জিডিপির ২ শতাংশ হওয়া উচিত। এসবের পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা খাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন শিক্ষানীতি, প্রশাসনিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয়ও সংস্কার আনা দরকার।

দ্বিতীয় আরেকটি দুর্বলতার দিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। তা হলো, গ্রামীণ অবকাঠামো।

আয়বৈষম্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

Policy Research Institute, Bangladesh. | 4

দ্রুত বরাদ্দ বাড়িয়ে গ্রামীণ রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ সুবিধা, সেচকাজ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে আরও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। এটা ঠিক, গত বছরগুলোয় গ্রাম উন্নয়নে সরকার অনেকটা ব্যয় বাড়িয়েছে। প্রধানত সে কারণেই খামারের উত্পাদনশীলতা ও খাদ্য উত্পাদন কয়েক গুণ বেড়েছে এবং দ্রুত জনসংখ্যা বাড়লেও সম্প্রতি খাদ্যে প্রায় স্বনির্ভরতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। তবে এখনো গ্রামীণ শ্রমশক্তির বড় অংশ স্বল্প উত্পাদনশীল ও স্বল্প আয়ের কৃষিকাজে যুক্ত। তাদের আয় বাড়াতে কৃষি উচ্চমূল্য সংযোজনমূলক বৈচিত্র্যকরণ হতে হবে এবং উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি, যা কৃষি থেকে সরিয়ে এনে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের অকৃষিজ কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। এভাবে শ্রমশক্তির রূপান্তর ঘটানো গেলে এটি অর্থনীতির গড় শ্রম উত্পাদনশীলতা বাড়াতে সহায়ক হবে এবং প্রবৃদ্ধি ও আয়বণ্টন পরিস্থিতিরও উন্নতি ঘটাবে। এসব করতে বর্তমান বাজেটে যতটুকু বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে, তা থেকে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে আপাতত জিডিপির ১ শতাংশ বরাদ্দ বাড়িয়ে দিলেই চলবে। পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে সাধারণ ব্যাংকঋণের সহজপ্রাপ্যতাও গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। এখন সীমিত পরিসরে এমন ঋণ দেয়া হচ্ছে বটে; কিন্তু সেটি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাড়িয়ে তোলা নিঃসন্দেহে এক বড় চ্যালেঞ্জ। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এ ক্ষেত্রে আরও ভূমিকা রাখার প্রয়োজন আছে।

তৃতীয় যে খাতটিতে সরকারি ব্যয় বেড়েছে তা হলো, সামাজিক নিরাপত্তা খাত। বর্তমানে এ খাতে বাজেট বরাদ্দ রয়েছে জিডিপির ২ দশমিক ৪ শতাংশ, যা পর্যাপ্ত নয়। এটিকে কমপক্ষে ৩ শতাংশ করতে হবে। এ ছাড়া সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন কর্মসূচির সুবিধা ভোগকারী নির্ধারণ এবং কর্মসূচির গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। সেগুলোর মূল্যায়নপূর্বক এ
ক্ষেত্রে সংস্কার আনা জরুরি।

শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, গ্রামীণ অবকাঠামো ও সামাজিক নিরাপত্তা খাত মিলে সরকারি ব্যয় জিডিপির আরও ৪ শতাংশ বাড়াতে পারলে আয়বৈষম্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো সম্ভব হবে। সমস্যা হলো, সাম্প্রতিক কালে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে আমার পরামর্শটিকে আপাতদৃষ্টিতে সরকারের কাছে একটি অসম্ভব চ্যালেঞ্জ মনে হতে পারে। তবে গভীরভাবে নিরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, আসলে এ অতিরিক্ত তহবিলের জন্য অর্থ জোগানো খুবই সম্ভব।

প্রথমত. সরকার কমবেশি জিডিপির ৪ শতাংশ ভর্তুকি দিয়ে থাকে বিভিন্ন খাতে। এর মধ্যে আবার জিডিপির ৩ শতাংশই হলো বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ভর্তুকি। বিদ্যুৎ ও জ্বালানিপণ্যের দাম বাড়ানোর মাধ্যমে ভর্তুকি সরাসরি অর্ধেক করা যেতে পারে। এ থেকে জিডিপির ২ শতাংশ সাশ্রয় করা সম্পদ আয়বৈষম্য দূরীকরণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচিতে ব্যয় করা যাবে।

দ্বিতীয়ত. সম্পদের অপর্যাপ্ততার একটি বড় কারণ কম রাজস্ব আদায়। বিশেষ করে ব্যক্তি খাতে

আয়বৈষম্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

Policy Research Institute, Bangladesh. | 5

আয়কর আহরণ হার কম হওয়া এর অন্যতম কারণ। প্রতি বছর জিডিপির মাত্র ১ শতাংশ ব্যক্তিগত আয়কর পায় সরকার। এখানকার সর্বোচ্চ উপার্জনকারী ৫ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে জাতীয় আয়ের ২৫ শতাংশ। সে হিসাবে আমাদের কার্যকর আয়করের হার মোট আদায়কৃত রাজস্বের মাত্র ৪ শতাংশ, যা অতিক্ষুদ্র। অথচ সর্বোচ্চ উপার্জনকারী ৫ শতাংশ জনসংখ্যার কার্যকর আয়কর হার ১০ শতাংশে উন্নীত করা গেলেও আয়কর থেকে পাওয়া মোট রাজস্ব জিডিপির ২ দশমিক ৫ শতাংশে দাঁড়াত। এ ছাড়া দেশের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী ১০ শতাংশ জনসংখ্যা, যাদের হাতে রয়েছে জাতীয় আয়ের ৩৫ শতাংশ; তারা যদি যথাযথভাবে ১০ শতাংশ করেও আয়কর দিতেন, তাহলে মোট আদায়কৃত আয়কর হতো জিডিপির ৩ দশমিক ৫ শতাংশ। তবে এ জন্য মূলধনি আয় যেন করজালের আওতামুক্ত না হয়, সেটি নিশ্চিত করা এবং তার সঙ্গে সম্পত্তি করব্যবস্থার আধুনিকায়ন, কর প্রশাসন ও কমপ্লায়েন্সের উন্নতি ঘটানো প্রয়োজন। এতে সার্বিকভাবে আমাদের রাজস্ব আহরণ বাড়বে।

এভাবে ব্যয় পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে ভর্তুকি থেকে বাঁচানো যাবে জিডিপির ২ শতাংশ। অতিরিক্ত প্রচেষ্টা নেয়া হলে আয়কর বাড়বে ২ দশমিক ৫ শতাংশ। মোট পাওয়া যাচ্ছে ৪ দশমিক ৫ শতাংশ অতিরিক্ত অর্থ। আর বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ সামাজিক কর্মসূচিতে আমাদের প্রাক্কলিত চাহিদা ছিল অতিরিক্ত ৪ শতাংশ বরাদ্দ। দেখা যাচ্ছে, আয়বৈষম্য দূরীকরণে আমরা যেসব পদক্ষেপ নিতে চাই সেগুলোর অর্থায়ন খুবই সম্ভব।

একটি অধিকতর কার্যকরী রাজস্বনীতির পাশাপাশি সুশাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেও সরকার আয় বণ্টনব্যবস্থার উন্নতি করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন আইনের শাসন নিশ্চিতকরণ ও যথাযথ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা। সাধারণভাবে যদি দেখার চেষ্টা করেন, এ দেশে আয়-ব্যবধান বাড়ার একটি প্রধান কারণ সুশাসনের ব্যর্থতা। সরকারি ব্যাংকে ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে একশ্রেণীর ব্যক্তির ত্বহঃ ◌ংববশরহম মনোভাব এবং সেটি পরিশোধে অনীহা, শেয়ারবাজারে ইনসাইডার ট্রেডিংয়ের মতো কিছু ক্ষতিকর হস্তক্ষেপ, কর ফাঁকির প্রবণতা, রাজস্ব আহরণ ও তা ব্যয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক দাপট দেখিয়ে পেশাদার ভূমিদস্যু কর্তৃক বিভিন্ন শাসনামলে সাধারণ মানুষের জমি দখল— সর্বোচ্চ আয়কারী ৫ শতাংশ মানুষের একটি শ্রেণী কী করে জাতীয় আয়ের ২৫ শতাংশ নিজেদের দখলে রেখেছে তারই স্বাক্ষর বহন করছে। এমন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সুশাসন নিশ্চিতকরণের বিকল্প নেই। কিছু মুখ্য প্রতিষ্ঠান যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাংক, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, সরকারি প্রতিষ্ঠান, কর বিভাগ, রাজউক, সিটি করপোরেশন প্রভৃতি রাজনৈতিক দিকনির্দেশনার বদলে নির্দিষ্ট পরিচালন নীতি ও জবাবদিহির ভিত্তিতে পরিচালিত করতে হবে। এসব বিষয় নিশ্চিত হলে আশা করি প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আয়বণ্টন পরিস্থিতিও উন্নততর হবে।

লেখক: অর্থনীতিবিদ, ভাইস চেয়ারম্যান, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই)